সর্বাঙ্গ। এত অন্ধকার এমন দুশ্চেদ্য তমসায় একটুখানি আলো যদি পাওয়া যেত!

আলো পাওয়া গেল। ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর। পটপট করে পাতা পোড়বার শব্দ—বন-মুরগীর ভীত কলরব চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বন-জ্যোৎস্না নয় দাবাগ্নি।

পুষ্করা

Elearning Info
https://www.elearninginfo.in

তর্করত্ন কালীপুজোয় বসেছিলেন।

শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আশ্বিনের জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশ, কোথা থেকে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় নদীর যে জল গলানো রূপোর মতো ঝলমল করছিল, তার রঙ এখন কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে। আর একবার খানিকটা কারণ গলাধঃকরণ করে তর্করত্ন ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে তাকালেন। ওপারের বন-জঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে। বাতাসে শীতের আভাস, তর্করত্নের মনে হল তবুও তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলছে, রোমকুপের রন্ধ্রপথে আগুনের কণার মতো বেরিয়ে আসছে ঘামের বিন্দু।

শুক্লা চতুর্দশীর রাতে কালী পুজো—কথাটা শুনতে অশোভন আর অশাস্ত্রীয় ঠেকছে। কিন্তু এ সাধারণ কালীপুজো নয়। আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়কদেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু! ছ মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো—দিব্যি আছে, কোনো রোগব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মরে যাচ্ছে। তাই দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে শ্মশানে শ্মশান-কালী পুজোর-আয়োজন। অসহায় বিপন্ন মানুষ তিথি-নক্ষত্রের দোহাই মানে না।

পাশেই একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে ; তার শাদা দীপ্তিটা কেমন নীলাভ হয়ে আসছে, তেল ফুরিয়ে গেছে বোধহয়। আলোটার ওপরে-নীচে নানাজাতের ছোট বড় পোকা এসে জমেছে। স্তূপাকারে। তারই অদূরে বসে কাশী কুমোর. গাঁজা খাচ্ছে আর গায়ের থেকে পোকা তাড়াচ্ছে ক্রমাগত।

মুখ থেকে গাঁজার কলকে নামিয়ে কাশী কুমোর বললে, এল?

অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে তর্করত্ন বললেন, নাঃ, কোনো পাত্তাই তো দেখছি না।

কাশী বললে, রাত তো প্রায় কাবার। ভোগ হয়ে গেছে কতক্ষণ। ও আজ আর আসবে না।

—আসবে না? আসবে না মানে?—বীরাসনে বসেও রক্তবস্ত্রধারী তর্করত্নের আপাদমস্তক থর থর করে কেঁপে উঠল।

—না এলে কী হবে জানিস? পুষ্করা পাবে! কারো রক্ষা থাকবে না, তোর নয়, আমার নয়—শ্মশানকালীর খাঁড়ায় কেটে কুটে একজাই হয়ে যাবে সমস্ত। একটি মানুষেরও আর বাঁচবার জো থাকবে না।

কাশী কুমোরের হাত থেকে গাঁজার কলকে খসে পড়ে গেল।

—ডাকো না ঠাকুর, ভালো করে মাকে ডাকো। এতকাল পুজো-আচ্চা করলে, এতবড় পন্ডিত তুমি, আর দেবীকে ভোগ খাওয়াতে পারলে না? ডাকো, ডাকো, প্রাণপণে ডাকো।

শুকনো মুখে তর্করত্ন বললেন, ডাকছি তো, কিন্তু—

একটু দূরে আধো অন্ধকারের মধ্যে বড় একখানা কলাপাতায় স্তূপাকারে লুচি সাজানো আর খানিকটা মাংস। তার ওপরে বড় একটা জবাফুল, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে চাপবাঁধা খানিকটা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। সেদিকে দুখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তর্করত্ন আবেগ-ভরা কম্পিত গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন, দেবি, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, জগৎকে রক্ষা করো—

কিন্তু কোথায় দেবী।

নিশিরাত্রের শ্মশান। শুধু শ্মশান বললে কম বলা হয়, এ মহাশ্মশান। অগভীর আর পঙ্কস্রোতা নদীর ধারে ধারে প্রায় তিন মাইল জুড়ে এই শ্মশান ছড়িয়ে পড়ে আছে, কত যে মড়া এখানে পুড়তে আসে তার হিসেব দেওয়া দুঃসাধ্য। আধপোড়া হাড়, মানুষের মাথা, চিতার কয়লা, পোড়া বাঁশ আর রাশি রাশি ভাঙা কলসী প্রতি বছর বানের সময় নদী পাড় ভাঙে, মুছে নিয়ে যায় অসংখ্য চিতার অঙ্গার চিহ্ন, মড়ার মাথা আর পোড়া হাড়ের টুকরোয় তার গর্ভ ভরাট হয়ে ওঠে। তার পরেই আবার নতুন চিতা জ্বলে, লক্‌লকে আগুনের শিখা প্রতিফলিত হয় অস্বাস্থ্যকর লালচে জলের ওপর, শ্মশান ক্রমশ এগিয়ে আসে লোকালয়ের কোল পর্যন্ত। আগে যেখানে মড়া নিয়ে যেতে হলে তিনখানা পর পর পোড়া জমির মাঠ পেরিয়ে যেতে হত এখন সেখান থেকে হরিধবনি দিলে গ্রামের ঘরে ঘরে তার সাড়া জেগে ওঠে।

তর্করত্ন পেছন ফিরে তাকালেন! নিঃশব্দ ঘুমন্ত গ্রাম। ঘুমন্ত? আতঙ্কে মুর্ছিত—মৃত্যুতে অসাড়। যে বাড়িতে সাতটি লোক ছিল তার চারটিই হয়তো মরে শেষ হয়ে গেছে, একজনের হয়তো ভেদবমি ধরেছে আর বাকি দুজন খুব সম্ভব শহরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। শুক্লা চতুর্দশীর রাতকে কালো মেঘে অমাবস্যার মুখোশ পরিয়েছে—এক কোণে থেকে থেকে বিদ্যুতের সর্পিল চমক; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো নদীর কালো জলকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে।

—দেবী প্রসীদ, প্রসীদ—

কাতর আর্তকণ্ঠে তর্করত্ন আহ্বান করছেন। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলেছে রাত্রির প্রহর, একপাশে রাখা টাইম পীস্‌টার কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে আড়াইটের ঘরে। তর্ক রত্নের হৃৎপিন্ডে উচ্ছলিত রক্তের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘড়ির কাঁটায়

তাল পড়ছে—টিক্ টিক্ টিক্। রাত যদি ভোর হয়ে যায়, দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন তা হলে—তা হলে—তর্করত্ন আর ভাবতে পারছেন না। অনিবার্য পুষ্করা। আর তার ফলে শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে। পুরোহিত, কুমোর—কারো রক্ষা নেই। টাকার লোভে বিদেশে এসে শেষে তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেল।

গাঁজার ঝোঁকে কাশী কুমোর ঝিমুচ্ছে। কেশব-ঢুলী ঢাকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে ওরা ঘুমুচ্ছে—আশ্চর্য! গ্রামের দিক থেকে মাঝে মাঝে এক একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—নিজের রক্তের মধ্যেও যেন তর্করত্ন শুনতে পাচ্ছেন সেই কান্নার প্রতিধ্বনি। বাতাসে পচা মড়ার গন্ধ ভাসছে—মুখে আগুন ছুঁইয়েই গ্রামের লোক মড়া ফেলে গেছে এখানে ওখানে। নদীর দুর্গন্ধ আবদ্ধ জলে সাদা মতন ওটা কী ভাসছে ; একটা মানুষ যে অমন অতিকায়ভাবে ফুলে উঠতে পারে এ যেন কল্পনাই করা যায় না! ঝোপে-ঝাপে শেয়ালের ডাক উঠেছে, আর তার জবাব দিচ্ছে মড়াখেকো শ্মশানকুকুরের একটানা কান্নার মতো অস্বাভাবিক আর্তনাদ!

চারিদিকে এত শেয়াল, অথচ দরকারের সময় একটারও দেখা নেই!

শিবাভোগ। শেয়াল এসে ভোগ গ্রহণ না করলে পূজো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তর্করত্ন বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারার মানুষ নন ; তিনি শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, দেবীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন। সারাজীবন এই করেই তাঁর কেটেছে। পন্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি আছে, নানা জায়গা থেকে ক্রিয়াকর্মে তাঁর ডাক আসে, বাঙলা দেশের বহু বড়লোকের বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় পান তিনি। তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে গ্রামের সমৃদ্ধ মহাজন আর তালুকদার বলাই ঘোষ তাঁকে ডেকে এনেছে দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর নিজের হাতে কামড় খেতে ইচ্ছে করছে, সমস্ত চেতনা চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাচ্ছে। এমন বিপদে তিনি জীবনে আর পড়েন নি।

বলাই ঘোষও সামনে নেই। তাঁকে পূজোয় বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়িতে গিয়ে বোধহয় ঘুম লাগিয়েছে। হয়তো ভেবেছে আর ভাবনা নেই। তর্করত্নের মতো সিদ্ধপুরুষ পঞ্চমুন্ডী আসনে বসে যিনি দৈনন্দিন কালী পুজো করেন, তিনি অনায়াসেই গ্রাম থেকে সমস্ত মড়ক আর আধিব্যাধির বালাই দূর করে দিতে পারবেন। কিন্তু তর্করত্ন যে কী সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে বলির পশুর মতো কাঁপছেন, একথা বলাই ঘোষের ভাববারও ক্ষমতা নেই! একবার বলাই ঘোষকে সামনে পেলে—তর্করত্ন হিংস্রভাবে ভাবতে লাগলেন—বলাই ঘোষকে সামনে পেলে তিনি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিতেন; সবংশে দেবীর উদরে যাও তুমি, তুমি উচ্ছন্নে যাও!

ঝিমুতে ঝিমুতে কাশী কুমোর হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

—কী ঠাকুর, কী খবর?

—খবর আবার কী? যা কপালে আছে, তাই হবে। কথার শেষদিকটা কান্নায় কাঁপতে লাগল।

—শেয়াল এল না?

নাঃ।—তর্করত্নের চোখে এবার অশ্রু ছলছল করে উঠল।

—ও আর এসেছে। কত মড়া পাচ্ছে খেতে, খিদে তেষ্টা তো নেই। আর তাজা মানুষের রক্তেই দেবীর পেট ভরছে। তোমার ওই শুকনো চিম্‌সে লুচি আর পোয়াটাক্ বোকা পাঁঠার মাংস খেতে তো বয়েই গেছে তাদের।

—তুই থাম হারামজাদা—বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন তর্করত্ন ঃ যা বুঝিসনে, তার ওপর কেন কথা কইতে যাস?

হে-হে-হে—নির্বোধ শব্দ করে কাশী কুমোর হেসে উঠল। গাঁজার নেশায় তার ভয়-ডর ভেঙে গেছে। আচ্ছা, থামলাম। ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়! আমার তো সবই ওলা-দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক—ওতে আমার কী হবে ঠাকুর।

তা বটে, তার কিছুই হবে না। কিন্তু তর্করত্নের তো তা নয়। তাঁর ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেপিলে আছে। তিনি মরলে তাদের খেতে দেবে এমন কেউ নেই। তিনশো টাকা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে কদিন! আর এই দুর্ভিক্ষের বাজার! মৃত্যু যেন চারদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে—একেবারে সমস্ত গ্রাস না করে তার ক্ষিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরছে। পুষ্করার বাকী আছে কোথায়!

সামনে কালী মূর্তি। কাঁচা কালো রঙ জ্বলজ্বল করছে, ঘামের মতো টপটপ করে তার দু-এক বিন্দু ঝরে পড়ছে দেবীর পায়ের তলায়—মহাদেবের সমস্ত মুখে এঁকে দিয়েছে বিষাক্ত ক্ষতের চিহ্ন। সমস্ত মূর্তিটা যেন জীবন্ত—চোখ দুটো রক্তে মাখা। এ মূর্তিও সাধারণ নয় তৈরী করতে হয় শ্মশানে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয় শ্মশানচিতার কয়লা, তারপর রাতরাতি বিসর্জন দিতে হয়। তাড়াতাড়িতে তৈরী করতে গিয়ে কাশী কুমোর দেবীর মূর্তিকে ঠিক দেবী করে গড়ে তুলতে পারেনি, সবটা মিলিয়ে একটা পৈশাচিক বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় তার একটা দীর্ঘ ছায়া পেছনে নদীর জলে গিয়ে পড়েছে, স্রোতের টানে সেই ছায়াটা কাঁপছে—পচা মড়ার দুর্গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসছে তর্করত্নের।

কাশী কুমোর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঢোলের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে কেশব ঢাকী। কী আশ্চর্য রকমে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ওরা। সমস্ত শ্মশান, সমস্ত দিকপ্রান্তর যেন কার মন্ত্রবলে ক্ষুব্ধ হয়ে গেছে। শেয়াল ডাকছে না গ্রামের দিক থেকে, মড়াকান্নাটা গেছে থেমে। শুধু মাথার ওপর শুক্লা চতুর্দশীর আকাশ মেঘের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আতঙ্কে যেন থমথম করছে।

হাওয়ায় অল্প শীতের আমেজ। পরনের খাটো রক্তবস্ত্রে শরীরে সবটা ঢাকা পড়ছে না। ভয়ের সঙ্গে শীতের শিহরণ মিশে গিয়ে তর্করত্ন কাঁপতে লাগলেন, কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল ঃ দেবি, প্রসীদ, প্রসীদ—

দূরে কলাপাতার ওপর শিবাভোগ শীতের স্পর্শে ঠান্ডা আর বিবর্ণ হয়ে আসছে। আর একপাত্র তীব্র কারণ গলায় ঢেলে নিলেন তর্করত্ন, মুহূর্তে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল। দেবী আসবে না? নিশ্চয় আসবে, আসতেই হবে তাকে। সারাজীবন ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে দেবীর আরাধনা করছেন তিনি। সাধারণ পূজারী যেখানে এগিয়ে যেতে সাহস করে না, সেই তান্ত্রিক পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে তিনি নিত্যপূজা করেন। তাঁর আহ্বান দেবীকে শুনতে হবে—শুনতেই হবে।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তিনটে। তা হোক।

তর্করত্ন নিজের মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ ধ্যান করেছিলেন খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময়ে চম্‌কে জেগে উঠলেন তিনি। দপ-দপ-দপ। আকস্মিকভাবে খানিকটা উগ্র দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠেই পেট্রোমাক্সটা নিবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের অন্ধকার যেন হুড়মুড় করে এসে ভেঙে পড়ল বিরাট একটা বন্যাস্রোতের মতো। গুঁড়োয় গুঁড়োয় জলের কণা ছড়িয়ে পড়ছে, বৃষ্টি নামলো নাকি?

উঠে আলোটা জ্বালাবার একটা প্রেরণা বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্ন নিঃসাড় হয়ে গেলেন। বৃথা হয়নি, মিথ্যে হয়নি তাঁর সকাতর প্রার্থনা। দেবী এসেছেন। কালির মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত সকাতর প্রার্থনা। দেবী এসেছেন। কালির মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত রোমাঞ্চিত দেহে দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দুহাতে সে শিবাভোগ গোগ্রাসে খাচ্ছে, তার দাঁতে লুচি আর মাংস চিবানোর একটা হিংস্র শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তর্করত্নের কানে ভেসে এল।

কিন্তু দু-হাতে? দু হাতে কি রকম? তর্করত্ন আবার তীব্র চমক অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। শেয়ালের তো হাত থাকে না। তা হলে—তা হলে—দেবী কি নিজের মূর্তি ধরেই তাঁর ভোগ গ্রহণ করতে এসেছেন?

নিজের মূর্তি ধরেই? ভয়ে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথা থেকে ঠেলে উঠল একটা দুঃসহ আনন্দের জোয়ার। সারাজীবন ধরে যে সাধনা তিনি করেছেন, আজ তা সম্পূর্ণ সার্থক হল। এই মহাশ্মশানে আর মৃত্যুর বিরাট উৎসবের মধ্যে দেবী এবার মূর্তি ধরেই নেমে এসেছেন। বিস্ফারিত চোখ মেলে তর্করত্ন দেখতে লাগলেন কী ক্ষুধার্তভাবে চোখদুটো জ্বলে উঠেছে! অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।

শিউরে উঠে তর্করত্ন চোখ বুজবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কে যেন সে দুটোকে জোর করে টেনে ধরে রেখেছে! কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, দেবীকে স্বচক্ষে দেখবে এত পুণ্য ওরা করেনি। চারিদিকে রন্ধ্রহীন

কালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে।

—দেবী প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, মারীভীতদের রক্ষা করো। প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও—

ভীত শুকনো গলায় উচ্চারিত হতে লাগল ক্ষীণ প্রার্থনা। কিন্তু এত নিঃশব্দে যে তর্করত্ন নিজেই তা শুনতে পেলেন না।

ঘড়ির কাঁটায় তাল পড়ছে—টিক্-টিক্-টিক্। তর্করত্নের বুকের মধ্যেও তার প্রতিধ্বনি। কালো অন্ধকারের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে সময় যেন এগিয়ে যেতে পারছে না, বার বার করে থমকে দাঁড়াচ্ছে। হাড় চিবানোর শব্দটা তারই মধ্যে ক্রমাগত কানে আসছে। তর্করত্নের গলা শুকিয়ে আসছে, সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। আর একবার একপাত্র কারণ খেয়ে নিতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু নড়বার সাধ্য নেই, কে যেন সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে অসাড় আর অনড় করে দিয়েছে।

—হি-হি-হি-

হঠাৎ একটা প্রকান্ড তীক্ষ্ণ হাসিতে সমস্ত শ্মশানটা থর থর করে কেঁপে উঠল। তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দিক দিগন্তে। মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপারের ন্যাড়া শিমুল গাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা। তর্করত্নের হৃৎপিন্ড যেন লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেই আবার ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ে গেল।

কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী চমকে জেগে আর্তনাদ করে উঠল। অমানুষিক ভয়ে বুজে-আসা চোখ দুটো খুলে তর্করত্ন দেখতে পেলেন, সে মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে একটা দ্রুত বিলীয়মান লঘু পদধ্বনি।

—জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা—তর্করত্ন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—ওরে বাজা, বাজা। আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন। বাজা—বাজা। জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা মহাকালী।

আবার পেট্রম্যাক্সের আলো জ্বলে উঠল। শিবাভোগ নিঃশেষিত। এমন হাতে হাতে প্রত্যক্ষ ফল সচরাচর দেখা যায় না।

কেশব ঢুলী প্রাণপণে ঢাকে ঘা লাগাল। কারণের বাকিটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করলেন তর্করত্ন। কাশী কুমোর গাঁজার কলকেটা নতুন করে সাজতে বসল।

রাতভোর হয়ে আসছে। সাড়ে চারটে। মাথার ওপর থেকে কালো মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, তার একপাশ দিয়ে অস্তগামী চাঁদের উজ্জ্বল আলো এতক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। যেন মৃত্যুর যবনিকা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্মশানকালী প্রসন্ন হাসিতে হেসে উঠলেন।

ভোরের আগেই এই অদ্ভুত ঘটনার কথা গ্রামের ঘরে ঘরে আলোড়ন জাগিয়ে দিলে। শ্মশানকালী নিজে এসে ভোগ গ্রহণ করেছেন, কলিযুগে দেবীর এমন প্রত্যক্ষ

আবির্ভাবের কথা আর শোনা যাবেনা। এখন আর ভয় নেই, এবার গ্রাম রক্ষা পাবে, দেশ রক্ষা পাবে। মারী থাকবে না, মন্বন্তর থাকবে না। মৃত্যুমগ্ন গ্রামের ওপর উল্লাসের তরঙ্গ জেগে উঠল। তর্করত্নের চোখ দিয়েও দরদর করে জল পড়তে লাগল। তাঁর সাধনা এতদিনে সফল হয়েছে—দেবী এসে সশরীরে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

বেলাবেলিই স্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তর্করত্নের। কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে যেতে দিলে না। বলাই ঘোষ তো গলায় কাপড় জড়িয়ে সারাদিনই তাঁর পদতলে পড়েই রইল। ধুলো দিতে দিতে পায়ের এক পর্দা চামড়াই উঠে গেল তর্করত্নের। আর সমবেত জনতার কাছে সত্যি-মিথ্যের রঙ চড়িয়ে ব্যাপারটা ফলাও করতে লাগল কাশী কুমোর।

—মাকে দেখবার পুণ্য তো করিনি, তাই পাপচোখে কী মোহ-নিদ্রাটাই নেমে এল। সবই তাঁর লীলা। আর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মা নিজেই নেমে এসে শিবাভোগ খেলেন। গলায় মুন্ডুমালা, হাতে খাঁড়া, জিভ থেকে টপ টপ করে পড়ছে রক্ত। তারপর সে কি ভয়ানক হাসি! শুনলে যেন পেটের পিলে ফুসফুস একসঙ্গে চড়াৎ করে ফেটে যায়। চমকে তাকিয়ে দেখি—

সমবেত জনতার উদ্‌গ্রীব ভয়ার্ত মুখের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করলে ঃ চমকে তাকিয়ে দেখি—

সন্ধ্যার পরে তর্করত্ন গোরুর গাড়িতে চেপে স্টেশনে যাত্রা করলেন। শেষরাতে ট্রেন ধরতে হবে। তারপর শহর।

গাড়ির অর্ধেকটা দানে আর দক্ষিণায় বোঝাই। কলা, মুলো, নারকেল, কাপড়—আরো কত কী। এদিক দিয়ে বলাই ঘোষের কার্পণ্য নেই, ধানের ব্যবসা করে সে মেলা টাকা কামিয়েছে এবারে। তা ছাড়া ঘোষপাড়া গ্রামটাই তালুকদার আর মহাজনের দেশ। যুদ্ধের বাজারে তারা মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নিয়েছে। দক্ষিণার অঙ্কে তিনশো টাকার জায়গায় তারা পাঁচশো টাকা তুলে দিয়েছে তার হাতে। তর্করত্ন প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন। পাঁচশো টাকা একটা কালী পুজোর দক্ষিণা! যুদ্ধে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি না হলে এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারত।

অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তর্করত্ন একটা বিড়ি ধরালেন। গাড়ী চলেছে মন্থর গতিতে। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আলো করে দিয়ে চমৎকার চাঁদ উঠেছে। কালকের মেঘাচ্ছন্ন শ্মশানের সঙ্গে এর এত তফাৎ! শহরের অনেকগুলো লক্ষ্মী-পুজো আজ তর্করত্নের নষ্ট হয়ে গেল—তা যাক, বলাই ঘোষ অনেক বেশি পরিমাণে তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে।

দুপাশে দূর-বিস্তৃত মাঠ। মাঠ উজ্জ্বল চাঁদের আলোর দিকে দিগন্তে ধানের শীষ দুলছে—চমৎকার ফলন হয়েছে। মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ তালের গাছ প্রহরীর মতো কালো ছায়া ফেলেছে। পথের দুপাশে কাঠমল্লিকার ফুল যেন গন্ধের মায়া

বিস্তার করে দিয়েছে। এখানে ওখানে গ্রাম ; এত শষ্য—এত জীবনের মধ্যেও মৃত্যু আর মন্বন্তরের স্পর্শে নিস্তব্ধ।

—হঃ-হঃ-হঃ—

জিহ্বা-তালু সংযোগে একটা প্রবল শব্দ করে গাড়োয়ান গাড়িটাকে থামিয়ে দিলে।

—কী হল রে?

তর্করত্ন চমকে উঠলেন। এই নির্জন মাঠের মধ্যে—ডাকাত নয় তো? সঙ্গে পাঁচশো নগদ টাকা, বিস্তর জিনিসপত্র। বড় ভরসাও নেই।

—রাস্তার ওপর ডোমপাড়ার পাগলিটা পড়ে আছে বাবু।

—কে ডোমপাড়ার পাগলি? কি হয়েছে?

—ওই—গাড়োয়ানের স্বরে বেদনার আভাস লাগল ঃ আকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে বাবু। তাই পাগল হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, যমে ধরছে বোধ হয়।

তর্করত্ন সভয়ে গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন।

—থাক, থাক যেতে দে। পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে চলে যা। যে রোগ, বিশ্বাস নেই বাবা।

গাড়ী চলতে লাগল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাশি রাশি জ্যোৎস্না—সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের মৃদু-গম্ভীর শব্দ ওরাও কি লক্ষ্মী পুজো করে নাকি? কোজাগরী। লক্ষ্মী ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে যান—কে জানে? চাঁদের দুধে ধানের শীষ পুর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। ফসলের ভরা ক্ষেতের মধ্যে থেকে থেকে একটি করে প্রদীপের শিখা। শস্য লক্ষ্মীকে আহ্বান করছে মাটির মানুষেরা, তাঁর পায়ের ছোঁয়া লেগে ক্ষেতের ধান সোনা হয়ে যাবে। কাঠ-মল্লিকায় সুরভিতে কি তাঁরই শ্রী অঙ্গের পদ্মগন্ধ?

তর্করত্নের মনটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠল। দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা। পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক। মা মহাকালী, তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।

এত ধান, এত ফসল, পুষ্করা কেটে যাবে বইকি। কিন্তু একটা জিনিস তর্করত্ন বুঝতে পারেন নি। তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই—আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে—কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে এক ফোঁটা জলের জন্য। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারে নি।

কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।